গ্রামীন কবিতায় সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কাহিনী

আনন্দ ভট্টাচার্য

বেশ কিছুকাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার উপাদান হিসাবে মহাফেজখানার নথিপত্র, সরকারী প্রকাশনা (যার অ াওতায় জেলা গেজেটিয়ার, জনসংখ্যা সমীক্ষা ও অন্যান্য বিষয়বস্তু) পর্যটকদের বিবরণ ও জেলা ঐতিহাসিকদের পর্যালে াচনা ব্যবহার করা হোত। এই উপাদানগুলির মধ্যে বেশীরভাগ যে ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের দৃষ্টিভঙ্গীকেই গুত্ব দিয়েছিল তা অস্বীকার করার উপায়নেই। ভারতীয় ইতিহাস চিন্তার জনক বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের অনেকের বক্তব্যেই একপেশে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। ইতিহাস বিশেষ করে আধুনিক ইতিহসের ক্ষেত্রে গবেষণা মানেই আর্কাইভ্স এবং তার নথিপত্রের চুলচেরা হিসেব নিকসে টোকার তাগিদে গবেষকদের ভিড় জমে যেত। আর্কাইভ্দের নথিপত্রকে যেমন নতুন করে বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে তেমনি তার সত্যতা যাচাই করাও দরকার।

রণজিৎ গুহ তাঁর আলোচনায় এটাই বলবার চেষ্টা করেছেন যে সরকারী নথিপত্রকে নতুন করে পড়ার প্রয়োজন রয়েছে, হয়ত এর মাধ্যমে ইতিসাহসচিন্তায় নতুন চিন্তাভাবনার অবকাশ থাকবে। ওনার আলোচনা মূলত ঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ওপর রচিত। যার ফলে তাঁর আলোচিত মতামত সম্বন্ধে দু - চার কথা বলা অ াবশ্যক। যদিও তিনি তাঁর আলোচনায় সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহকে স্থান দেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা অ্যবশ্যক যে তাঁর ভাবনাচিন্তা বর্তমান প্রবন্ধ লেখার পথে এক বিশেষ সহায়ক। তিনি সম্ভবত ঃ পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন যে ১৭৮৩ সালের রংপুরের কৃষক আন্দোলনে রতিরাম দাসের 'জাগের গান' সরকারী নথিপত্রের সীমাবদ্ধতাকে পাশ কা টিয়ে সুসমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছিল। তিনি সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহকে তাঁর আলোচনায় ঠাঁই দেননি একারণে যে এই বিদ্রোহে কৃষক দের কোনো ভূমিকা ছিল কিনা সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে সন্দিহান ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে আরো দু-এক জনের নাম করা যেতে পারে যারা হলেন রণজিৎকুমার সমাদ্দার ও অনিমা মুখোপাধ্যায়। এদের মধ্যে প্রথম জনের বক্তব্যের বিষয় বস্তু হল সাহিত্য সংস্কৃতি স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব (১৭৫৭-১৮৫৭)' আর দ্বিতীয়জন বাংলা পুঁথিতে আঠারো শতকের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এঁদের আলোচনায় মূলত বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দ মঠের প্রসঙ্গআলো চিত হয়েছে। যদিও সমাদ্দার তাঁর বক্তব্য কে জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন কয়েকটি কবিতা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।বিদ্রোহের মূলধারার সঙ্গে গ্রাম্য কবিতায় আলোচিত বক্তব্যের কোন বিশ্লেষণ কিন্তু তার ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না। অন্যদিকে অনিমা মুখোপাধ্যায় সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে পুঁথি তো দূরের কথা সমসাময়িক কবিতাগুলিকে ব্যবহার কর ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি পুঁথি বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তাও পাঠকসমাজের কাছে খুব একটা পরিষ্কার নয়, সমাদ্দার এবং মুখোপাধ্যায় উভয়েই রায় সাহেব যামিনী মোহন ঘোষ ও জাতীয় অভিলেখ্যাগার থেকে প্রকাশিত বহু ব্যবহৃত Calendar of Persian Correspondence থেকে পাতার পর পাতা উদ্ধৃত করেছেন। এমনকি মহম্মদ আলি সুজ্জামানের নাম উল্লেখ করাও বাঞ্ছনীয়। তিনি তাঁর মুসলিম মানুষ ওবাংলা সাহিত্যে ফকীর বিদ্রোহ প্রসঙ্গে কোন আলে াচনাতেই যায়নি। অবশ্য আখতাজ্জানাস ইলিয়াসের খোয়াবনামায় ফকীর বিদ্রোহের পটভূমিকা স্থান দখল করে আসে। তবে ইলিয়াসের বক্তব্য যে অনেকটাই কল্পনাশ্রয়ী ও অবাস্তব পটভূমিকায় রচিত সে বিষয়ে কোনসন্দেহ নেই। এই ধারার অন্তর্ভুক্ত নাট্যকার উৎপল দত্ত বা বাংলাদেশ থেকে খালেদা চৌধুরী রচিত 'রক্তাক্ত অধ্যায়'। যদিও চরিত্রগুলিঐতিহাসিক

কিন্তু তাদের বক্তব্য ইতিহাসের থেকে অনেক দুরে। যার ফলে কোথাও তারা দেশপ্রেমিক, সংগ্রামী কৃষক নেতা বা অবতার হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন।

এবার বাস্তব পরিস্থিতিতে ফিরে আসা যাক। সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায় কারা? এদের সম্বন্ধে সরকারী নথিপত্রে বা অন্যান্য তথ্যে কী ধরনের বক্তব্য পেশ করার হয়েছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহুধর্মী মন্তব্য পাঠক সমাজের কাছে নানাবিধ প্রশ্ন তুলে ধরেছে। বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠে সন্ন্যাসীদের অনুশীলন ধ্যানে দীক্ষিত একদল সন্ন্যাসীর পরিচয় দিয়েছেন যারা দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের জন্য ও মুসলমান শাসনের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে হিন্দুধর্মের পুনখানের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। বঙ্কিমবাবু একজন তাত্ত্বিক দ্রষ্টা হিসেবে অনুশীলন ধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত একদল সন্ন্যাসীর স্বপ্নে দেখেছিলেন যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে প্রস্তুত। বঙ্কিমবাবুর ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যাখা দুজন সিভিল সার্জেন্ট যথাত্রমে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই . সি . এস. এবং যামিনী মোহন ঘোষ, বি. সি. এস. (রায়সাহেব উপাধিপ্রাপ্ত) সরকারী নথিপত্র ও বেসরকারী তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরী করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে সন্ন্যাসী ও ফকিররা ছিল 'desolating blast' ও জাতির পক্ষে অভিশাপ। তাঁরা হেস্টিংসের জীবনীকার রেভারেন্ড গ্লিগের মতামতকেই প্রতিধবনি করেছেন যে তা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী 'as if they dropt from heaven to punish the inhabitants' । অন্যদিকে আবার একই তথ্যের ভিত্তিতে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহকে গণসংগ্রামের আদলে ব্যাখ্যা করতে প্রস্তুতআরেকদল ঐতিহাসিক। তাঁদের মতে সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায় মোঘল আমল থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকী বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল এবং চাষবাসের মারফৎ কৃষকে পরিণত হয়েছিল। এই কৃষকরাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় যখন বাংলার অর্থনীতি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল তখন তারা বিক্ষুদ্ধ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তাঁদের মতে বিক্ষুদ্ধ কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দেবার মত শক্তি যোগাবার জন্য সন্ন্যাসী ও ফকীররা এগিয়ে এসেছিল।

আলোচনার শুতে যে বক্তব্য জোরের সঙ্গে বলা হয়েছিল যে সরকারী নথিকে নতুন করে পর্যালোচনা করার দরকার। সে দায়িত্ব নিয়ে এ সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি যে সন্ন্যাসী ও ফকীরদের ত্রিয়াকলাপে ডাকাতি, লুণ্ঠন বা উগ্র হিংস্রতা থাকলেও তারা কিন্তু কোনোভাবেই ডাকাতের পর্যায়ভুক্ত নয়। আবার অন্যদিকে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না যাতে বলা যেতে পারে যে দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকদের নেতৃত্ব দেবার জন্য সন্ন্যাসী ও ফকীররা এগিয়ে এসেছিল বা নেতৃত্ব দিয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য সরকারী নথিপত্রের ভিত্তিতে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সম্বন্ধে যে চিত্র পাওয়া যায় তার সঙ্গে সমসাময়িক কালে প্রকাশিত যে লোক কবিতাগুলি পাওয়া যায় তার বক্তব্যের কতটা সামঞ্জস্য বা অসংগতি ছিল তার এক আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ। এই প্রসঙ্গে যে পাঁচটি কাব্যধর্মী আলোচনা চিন্তার উদ্রেক করে তার প্রথমটি হোল মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা কবীর যিনি সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী রেখে গেছেন তা আলোচনা করা। কবীরের নিজের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা সম্ভবপর না হলেও তার এক ইংরেজি অনুবাদ নীচে দেওয়া হল।

"Never have I seen such yogis, Brother.
They wander mindless and negligent
Proclaiming the way of Mahadeva.
For this they are called great Mahants.
To markets and bazzars they bring their meditation,
False siddhas, lovers of Maya.
When did Dattatreya attack a fort?
When did sukhdeva join with gunners?
When did Narada fire a musket?
When did Vyasadeva sound a battle cry?
These make war, slow witted
Are they ascetics or archers?
Become unattached, greed is their mind's resolve
Leering gold they share their profession,
Collecting stallions and mares and

Acquiring villages they go about as tax collector.

কবীরের বক্তব্য যে আঠারো শতকের সরকারী নথি থেকে পাওয়া বক্তব্যের থেকে কোনো অংশে আলাদা নয় সে বিষয়ে কে ানো সন্দেহ নেই। কবীর যেটিকে বলেছেন যে সন্ন্যাসীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে চাঁদা আদায় করছে সেটিকে গভর্ন জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কোর্টঅফ ডিরেক্টস এর সদস্যরা বলেছেন 'begging, stealing and wandering in the name of religion'। গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের কাছে 'religion' ছিল এক অজুহাত যার সুবাদে তারা চাঁদা আদায়ের নামে 'ন্দ্বপ্রব্ধক্ষজ্জব্ধনক্ষ' করেছে। সন্ন্যাসীরা যে সর্বভারতীয় স্তরে তাদের যাতায়াতের সমকালে মোঘল আমল থেকে চাঁদা আদ ায় করত এবং হঠাৎ প্রাপ্ত হলে অস্ত্র তুলে ধরতে দ্বিধা করত না তার অজস্র প্রমাণ পর্যটকদের বিবরণে যেমন পাওয়া যায় তেমনি পরবর্তীকালে সরকারী নথিতে এরপ্রমাণ মেলে। সন্ন্যাসীরা যে নিজেদের মধ্যে মারামারি করত এবং চাঁদা আদ ায়ের সময়ে নিষ্ঠুরতম আচরণ প্রদর্শন করত সে সম্বন্ধেকবীরওয়াকিবহাল ছিলেন এবং কবীর তাদের ধর্মীয় ভাবকে মর্যাদা না দেওয়ায় তার কাছে সন্ন্যাসীরা 'ভন্ড সাধু' হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। কবীরের দৃষ্টিভঙ্গী যে কাশী পরিক্রমা২ প্রণেতা ভূকৈলাশের জমিদার জয়নারারণ ঘোষালের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করেছিল তা আমরা নীচের বক্তব্য থেকে উপলব্ধি করতে পারি। জয়নারায়ন ঘোষাল কাশীর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন কিন্তু এই ইতিহাসে বর্নিত আখ্যান দশনামী নাগা সন্ন্ যাসীদের গ্রামভিত্তিক জীবনযাত্রাকে তুলে ধরেছে। এখানে মনে রাখতে হবে যদিও নাগা সন্ন্যাসীরা আঠারো শতকের মধ্যভ াবে বাংলায় বিদ্রোহ করেছিলেন কিন্তু তারা ছিল মূলতঃ বেনারস (কাশী) অঞ্চলের মহাজনী কারবারে লিপ্ত একদল ব্যক্তি যারা ব্যবসা - বানিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করত। কাশীর জনবর্ণন করতে গিয়ে ঘোষাল লিখছেন ঃ

"দশনামী সন্ন্যাসীর কত শত মঠ।
বাহ্যে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃপঠ।।
সদাগরি মহাজমি ব্যবসা সভার।
এক এক জনার বাটী পর্বত আকার।।
সোনা কদম্ব - ফুল সহিত জিঞ্জির। (শৃঙ্খল)
কার কর্ণে শোভা করে যেমত মিহির।।
মনিসহ স্বর্ণগুলক (কর্ণাভরণ বিশেষ) কার কার গলে।
প্রবাল কনকমালা কার গলে দোলে।।
কার করে সোনার রূপার তার বালা।
এসব ভূষণ ধরে যেই প্রিয় চেলা।।
বসন গেয়া বঙ্গ সভে অস্ত্রধারী।

তুরঙ্গম রঙ্গে কেহ করে আসোয়ারি (অশ্বারোহী সৈন্যের কাজ) জয়নারায়ণ ঘোষালের বক্তব্য আঠারো শতকে পূর্ব ও উত্তর বাংলায় অভিভূত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সন্ন্যাসীদের কথাই তুলে ধরে। সমসাময়িক নথিপত্র স্পষ্ট প্রমাণ করে যে সন্ন্যাসীরা দশনামী সম্প্রদায় বলে কথিত, যারা চারটি মঠকে কেন্দ্র করে নিজেদের ধর্মীয় ও অন্যান্য কাজকর্ম চালাত। তারা মঠকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা চালাত এবং কেবলমাত্র বেনারসেই মঠের সংখ্যা ছিল আঠারোশোর ওপর। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে দুটি ভাগ গোঁসাই ও নাগা, গোঁসাইরা যে মঠে থাকত সেগুলি প্রায় এক একটা দুর্গের মত। আমার পক্ষে এলাহাবাদ ও বেনারসে যে কটি মঠ দেখা সম্ভবপর হয়েছিল সেগুলি হল মহানির্বানী, নিরঞ্জনী, জুনা, অটল ও আবাহন আখড়া। এই অ াখড়ার কথাই জয়নারায়ণ ঘোষাল তার গ্রন্থের পাদটীকায় বলেছেন "সন্ন্যাসীদের মূল আখড়ার নাম - নির্বানী, নিরঞ্জনী, অটল, আবাহ, জুনা...." জয়নারায়ণের বক্তব্যের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনো প্রভেদ নেই। গ্রামের অভ্যন্তরে আখড়া প্রতিষ্ঠা করে তারা তাদের ব্যবসায়িক লেনদেন ও সামরিক অস্ত্র বিদায় প্রশিক্ষণ নিত। এই আখড়া থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোঁসাই রাজেন্দ্র গিরি ও হিম্মত গিরি দেশীয় রাজা বিশেষ করে অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌল্লা ও অ াসফ উদ- দৌল্লার হয়ে লড়াই করে। এরাই আবার গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে জাতির পক্ষে ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মন্তব্য করেছেন ও তাদের বিদ্ধে মারমুখী ভূমিকা গ্রহণ করেন। দশনামী সন্ন্যাসীরা যারা বিশেষ করে গোঁসাই বলে পরিচিত একদিকে পরত গেয়া বসন, কানে সোনার দুল, গলায় দ্রাক্ষের মালা, মাথায় রাখত জটা, গায়ে ছ াই মাখত -- গর্ভনর জেনারেল হেস্টিংসের কাছে এই সন্ন্যাসীরাই ছিল 'curious'

গোঁসাই রাজেন্দ্র গিরি ও হিম্মত বাহাদুর প্রসঙ্গে সুদানের লেখা সুজনচরিত মৈথিলীভাষায় যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তার সঙ্গে সরকারী নথিপত্রের বা পর্যটকদের বিবরণে অথবা জেলা ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণে কোন পার্থক্য নেই। এই দশনামী গোঁসাইদের সম্বন্ধে এক পুঙ্খানুপুঙ্খ কাব্যিক বিবরণ আরেক কবি পদ্মাকর রচিত 'হিম্মত বাহাদুর' বিদবলী৩ থেকে পাওয়া যায়। পদ্মাকার যদিও হিম্মতাবাহাদুরের প্রবল প্রতিপক্ষ নোনে অর্জুন সিং (বাংলার রিজেন্ট) এর গৃহশিক্ষক ছিলেন, যার সুবাদে অজুর্ন সিং এর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও তাঁর কাছে নায়ক ছিল গোঁসাই হিম্মত বাহাদুর, যে কারণে তার বীরত্ব বর্ণনা করা খুবই স্বাভাবিক। এখানে তিনি হিম্মত বাহাদুরের বীরত্ব মহাভারতের অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক যে এই গাথাধর্মী কাব্য সাহিত্য পুরোটাই হিন্দী ভাষায় যা এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা কষ্টকর। তবে এর ইংরেজির তর্জমা খানিকটা পাওয়া যায় William Pinch৪ এর আলোচনায় আর যা প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। কবিতাধর্মী বিশ্লেষণ না করে মূল কিছু অংশ গদ্যের আকারে ব্যাখাকরা যেতে পারে। 'হিম্মত বাহাদুর বিদাবলী' অভিধা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে পুরো গাথাটাই হিম্মত বাহাদুর, তাঁর চেলা ও পরিবারবর্গকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এই গোঁসাইদের জীবনযাত্রা গ্রামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। গোঁসাই হিম্মত বাহাদুর তার ভাই উমরাও গিরি ও তাঁদের গুরাজা রাজেন্দ্র গিরির জন্মবৃত্তান্ত, শৈশব বা বাল্যকাল, কিভাবে আখড়ায় তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত, গু শিষ্যের সম্পর্ক কিরকম হওয়া উচিত তা বর্নিত হয়েছে। এই কাব্যে বর্নিত হয়েছে হিম্মত বাহাদুরের চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে কবি পদ্মকরের দৃষ্টিভঙ্গীর এক ইংরেজী তর্জমা দেওয়া হল ৫

Himmat Bahadur is a great king, incomparable in his excellent benevolence.
He is generous. Brave and compassionate, [but] to his amassed enemies he is death itself.
He humiliates his enemies and scorches them in their jungle hideaways.
He shows his long – armed compassion for the poor during religious sacrifices.
He gives endowments to support dharma, and is the clothing that covers Hindu shame.
He is the embodiment of radiant splendor, but an insatiable demon when his anger is provoked.
He is as true to his word as Harishchandra, [and] is ever the source of bliss.
He is the enemy of sadness, constantly engaged in sacrificial rites.
The lamp of his own sect blazes radiantly, [he is] the most valiant protector of the earth.
To the class of poets he is like the sun to the lotus, [and] is full of benign moral conduct.
He is extremely knowledgeable, [and] always puts forth a serene countenance.
When he sees the needy he is compassionate, when destroying evil he is merciless.
He is a remarkable horseman and an unsurpassed archer.
He chants Siva bhajans with such excellence and equanimity – no one can compare.
Himmat Bahadur is a powerful king, his army's presence immediately destroys his enemies.
And after briefly describing the Rajput army, Padmakar returned to the praise of Anupgiri :
Now I'll sing of an army that all the Thakurs [Rajput landlouds] have heard of.
Near the massive Ajaygarh fort, united they are fearsome.

ও পরের বর্ণনায় সন্ন্যাসী বা গোঁসাইদের অভ্যন্তরীন বা সাংগঠনিক ইতিহাস জানা গেলেও তাদের বিদ্রোহী সত্ত্বা ও গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে সন্ন্যাসী ও ফকীরদের যোগাযোগ কি ধরনের ছিল তা আমরা অন্যান্য তিনটি কবিতার থেকে বিশ্লেষণ করব। সন্ন্যাসী ও ফকিররা যে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে উত্তর ও পূর্ব - বাংলার বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করত ও গ্রামীন মানুষ - জমিদার ও প্রজারা এই সন্ন্যাসীর ও ফকিরদের নিয়মিত চাঁদা প্রদান করত। গ্রামের অভ্যন্তরে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের যাতায়াতের সুবাদে গ্রামীন সমাজের সঙ্গে ভাব - বিনিময়ের এক আদান - প্রদান ঘটায় হয়ত গ্রামীন মানুষের সঙ্গে সংযোগ গঠনের এক সুযোগ ছিল। এর ভিত্তিতে কেউ কেউ বলবার চেষ্টা করেছেন যে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের এক যোগসূত্র ঘটেছিল যার ভিত্তিতে তারা বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে বিশেষকরে ছিয়াত্তর মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সাহায্য করেছিল এরকম বক্তব্য পেশ করা হয়। এই বক্তব্য কতকটা যুক্তিযুক্ত তা খতিয়ে দেখার জন্য সমসাময়িককালে প্রকাশিত কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। প্রথম কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১২২০ বঙ্গাব্দে। লেখক পঞ্চানন দাসের কবিতাটি রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১৩১৭ বঙ্গাব্দে) যদিও রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় এই কবিতাটা ছাপা হয়েছিল কিন্তু তিনি সেখানকার অধিবাসী কিনা সে সম্বন্ধে কোনরকম তথ্য পাওয়া য

ায় না। কবি পঞ্চানন দাসের লেখা ‘মজনুর কবিতা’ না পাওয়া গেলেও এটা মনে করা যেতে পারে যে কবি পঞ্চানন দাস বিদ্রোহের সমসাময়িক ছিলেন অথবা সমসাময়িক লোকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত বর্ণনা তাকে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরতে প্রভাবিত করায় তিনি শুই করেছেন এইভাবে।

“বাংলা নাশের হেতু মজনু বারনা।।
কালান্তক যম বেটাক্ কে বলে ফকির
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা হবে স্থির।।

পঞ্চানন দাসের বর্ণনার সঙ্গে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাদের দেওয়া বিবরণ বা গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর বক্তব্যের কোনও পার্থক্য নেই, কারন কোম্পানীর দৃষ্টিতে সন্ন্যাসী ও ফকিররা ছিল freebooter, marauders, dacoits, criminals, ‘enemies to the government’, আবার একথাও বলা হচেছ দ্রব্দ নন্দ্র ব্ধড়ন্দ্বম্ভ স্তুক্তম্পস্মাব্ধ ন্দ্রক্তম্পপ্প ড়ন্দ্ধন্দ্ধ ব্ধপ্স স্মাক্তুন্দড় ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্ভন্দ্বব্ধব্দ*,

ফকিররা যে আবার তীর্থযাত্রার সময় দলবল - সমেত যাতায়াত করত ও সঙ্গে উট, গাধা, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যেত যার কথা সরকারী প্রতিবেদনে যেমন লক্ষনীয় তেমনি কবির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা হচেছ এভাবে

“সাহেব সুভার মত চল সুঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডা বান বাউল নিশান।।??
উট গাধা ঘোড়া হাতি কত বোগদা সঙ্গতি।
জোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিয়ে ভয় অতি।।

তাদের সঙ্গে যে অসংখ্য তেলেঙ্গা ও বরকন্দাজরা থাকত এবং মজনু শাহ যেন তাদের নেতৃত্ব দিচেছ এরকম বক্তব্য কবি পেশ করেছেন এভাবে,

“চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।
মজনু তাজির পর যেন মরদগাজি।

মজনু শাহ ও তার দলবলের আর্বিভাবে সাধারণ মানুষের মনে ত্রাস সঞ্চার হত এবং তার দন লোকজন যে এক স্থান থেকে অন্যত্র পালাত তার কথা কবির বর্ণনায় পাওয়া যায়

“দলবল দেখিয়ে সে আক্কেল হৈল গুম।
থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধূম।।
বড়ই দুখিত হৈল পলাইব কোথা
মন দিয়া শুন সঙ্গে লোকের অবস্থা।।
ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়
গাছুয়া বেপারি পলায়া গাছে ছ্যাড়া গুর।।
নারী লোক না বান্ধে চুল না পরে কাপড়,
হালুয়া ছাড়িয়ে পালায় লাঙ্গাল জোয়াল।
পোয়াতি পলায় ছাড়ি কোলের ছাওাল।।
বড় মানুষ্যের নারী পালায় সঙ্গে লয়া দাসী।।
জটার মধ্যে ধন লয়া পালায় সন্ন্যাসী।।

সন্ন্যাসী ও ফকিররা যে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদার অজুহাতে জোর জবরদস্তি করে টাকা আদায় করত এবং তা দিতে না পারলে সাধারন মানুষের অত্যাচারে সামিল হোত তা কবির বর্ণনা থেকে স্পষ্ট। কোম্পানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের এই অত্যাচারের দন বাংলার শাসন ব্যবস্থা এতটাই ভেঙে পড়েছিল যে বাংলার মানুষজনকে তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোম্পানীর হস্তক্ষেপ ও সন্ন্যাসী - ফকির দমন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাদের অত্যাচারের কাহিনী কবি বর্ণনা করেছেন

“থাল, লোটা লইল না পাইল উদ্দিশ।

টাকার নালচে চিরে শিওরের বালিশ।।
আলদা মাটী দেখি ফকির করে পোচ পোচ।
টাকার লাগি যে মারে বাক্সর ঘোট।।
মহাজনের সিন্দুক কাড়ি টাকা লইল ঝাড়া।
আগে লুটে বাড়ী ঘর পাছে আড়পাড়া।।

কবির বর্ণনা কিন্তু অতিরঞ্জিত হয়েছে যখন কবি তাদের চরিত্র হনন করেছেন এভাবে যে গ্রাম বাংলার নারী - যুবতীরা পর্যন্ত সন্ন্যাসী ও ফকিরদের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

''ভাল মানুষের কুলবধু জঙ্গলে পালায়।
লুটরা ফকির যত পাছে পাছে ধায়।।
বসন কাড়িয়া লয় চাহে আলিঙ্গন।
যুবতী কাকুতি করি কি বলে বচন।।
সুজন ফকির হয়ে শুনি হস্ত দেয় কানে।
অধম ফকির হাত বাড়ায় যৌবনে।।

কবির এই বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। কবিতার শিরোনাম 'মজনুর কবিতা' স্পষ্টই প্রমাণ করে যে তাকে এবংতার তরিকা অর্ন্তভুক্ত মাদারী ফকিরদের নিয়ে কবিতা রচিত হয়েছে। মাদারীরা অবিবাহিত জীবন যাপন করত এবং কৌমার্য ছিল তাদের জীবনধারণের অন্যতম অঙ্গ, নারী সঙ্গ তাদের চিন্তার বাইরে, কারন পীর পরম্পরকে অনুসরণ করায় তাদের পীর সৈয়দ মুহম্মদ জামালউদ্দিন অবিবাহিত থাকায় মাদারী ফকিরদের কাছে অবিবাহিত থাকা এক আদর্শ হিসেবে কাজ করত। আসলে ফকিররা চাঁদা আদায়ের বা নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভয়ংকর ও হিংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করত তা গ্রামীন মানুষের জীবন যাত্রাকে এতটাই অতিষ্ট করে তুলেছিল যে ফকীরদের চরিত্রকে কলঙ্কিত করে তোলার জন্য কুৎসা রটনা ছাড়া কবির কাছে অন্য কোন উপায় ছিল না। এই স্মরণে কবির দৃষ্টিভঙ্গী যে নিরপেক্ষ নয় বরং পক্ষপাতমূলক সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

একই বছরে আরেকটা কবিতা রচিত হয়েছিল। কবির নাম দ্বিজ গৌরীকান্ত যিনি পূর্ববাংলার বগুড়া জেলার অর্ন্তগত নালি গ্রামে বাস করতেন। মহাস্থানগড় যেখানে করতোয়া নদীর সংযোগস্থলে পৌষ - নারায়ণী যোগে বানী স্নান উপলক্ষে দশনামী সন্ন্যাসীদের মিলন ঘটত সেই পটভূমিকায় এই কবিতাটি লেখা হয়েছে। এই স্নান উপলক্ষ্যে রাজা - মহারাজা, জমিদার বা সাধারণ মানুষ যে মিলিত হত তারা সন্ন্যাসীদের আগমন সংবাদ শুনে এতটাই ত্রস্ত হয়ে উঠত যা অনেক সময় ভীতির সঞ্চার করত। তাদের আগমনেরসংবাদে অধিবাসীরা কেবলমাত্র শঙ্কিতই হোত না, পালিয়ে তাদের প্রাণ বাঁচাত। পঞ্চানন দাসের বক্তব্য বা সরকারী নথিপত্রে সন্ন্যাসীদের ত্রিয়াকলাপ যে দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়েছে - সেই একই মনোভাব দ্বিজ - গৌরীকান্তের বর্ণনায় আমরা লক্ষ্য করি ঃ-

মহারাজা রামকৃষ্ণ চলিলেন স্নানে।
আরও যত রাজা ছিল ভাবে মনে মনে।।
বর্দ্ধনকুটীর রাজা আইল মনে হয়া হৃষ্ট
সুসঙ্গের রাজা আইল কুলীনের শ্রেষ্ঠ
যুগলরায়ের পুত্র আইলেন থাকি জাফরসাহী।
গোপাল রায়ের পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের ভাই।
কচুয়ার লাড়ি আইল জামাল পুরে আচার্য।
গোঁসাই ডোমনগিরি চলিলেন যেন দ্রোণাচার্য।।
.....
দিন ক্ষ্যাণ পূর্ণ হৈল প্রসবিল পথে।।
দান ধ্যান করি সভে হইলেন খুসী।

সেরপুর হৈতে গেলেন অনুপ মুনসী।।
মঙ্গলবারের দিন আইল ছয়শত সন্ন্যাসী।
তারা কাশীবাসী , মহাঋষী, উর্দ্ধবাহুর ছটা।
বম্ বম্ বম্ গাল বাজাইছে, পায় পড়িছে জটা।।
লেঙ্গটা সন্ন্যাসী তবে যে দিগেতে ধায়।।
মুখে বস্ত্রো দিয়া কত স্ত্রীলোক পালায়।।
সন্ন্যাসী আইল বল্যা লোকের পড়্যা গেল শঙ্কা।
যুগলরায়ের পুত্র পালায় বাজাইয়া ডঙ্কা।।
সন্ন্যাসী আইল বল্যা লোকের পড়্যা গেল শঙ্কা।
যুগলরায়ের পুত্র পালায় বাজাইয়া ডঙ্কা।।
সন্ন্যাস আইল বলা লোকের পৈল উৎরোল।
সতেক বাদ্দাল পালায় করি গণ্ডগোল।
এক বাদ্দালে বোলে আলো শুন মোর বাই।
পুড়া পুড়ি লগে লয়া দেশকে চল্যা যাই
হিনান করিব্যাম দরগা দেখিব্যাম মনেছিল দাদ।
পুড়ি মাগিক লগে আন্যা হবে কৈলাম বাদ।।
হন্যাশী দা বেটারা যদি লাগুল পাইব্যাম্।
বেন্তের বারি দিয়া দৈর্য্যা লয়্যা জাই ব্যাম।।
বেটারা দুটি বর, হিপাহি দড়, থাকে পশ্চিমে দ্যাশে।
হাজারে হাজারে, বেটারা, লুট করিতে আইসে।।
বেটাদের অস্ত্র আছে, রাখা কাছে, বন্দুক সাঙ্গি তীর।
তরার চিমীঠা, খাপে ঢালা ঢাকা শির।।
দেখশুনা গোড়া আইসে, কুটমুটাইতে পিহাই আনৃসে আড়ে।
কিম্বাই কর্য্যা পড়ে জানি কোনবা মাউগের গাড়ে।
পৃঃ ৪৮ কেউ দৌড়্যা যায় আছাড় খায় বুকে লাগে ঘিল।
উর্দ্ধশাসে কেউ দৌড়ে, ভাতারে মারে কিল।।
মাগি দৌড়া চল নাইক বল, অখন গেল মান।
ভাল মানুষে আব রাকে পল্যা রাখে প্রাণ।।
কবিতা রচিল দ্বিজ গৌরী কান্ত নাম।
নিবাস তাহার বটে নালি গ্রাম।।
বগুড়ার (পূর্ব ভাগ) চেল পাড়া গ্রাম।
দ্বিজ কুলে উৎপত্তি সেই করে গান।।

শেষ কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১২৮০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের এক জম্মাবারে। কবিতার বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে বীরভূমের হাটকালুয়া গ্রামের অধিবাসী ঝাবু দফাদারের ছেলে জমীরউদ্দীন দফাদার 'মজনু শালের হকিকত' নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি কোথাও ছাপা না হওয়ায় এটিকে পুঁথি বলে দাবী করা হচ্ছে। তবে এটি পুঁথির কৃতিত্ব দাবী করতে পারে কিনা সে বির্তকে যাচ্ছি না। কাটোয়ার এ্যাডভোকেট এম. আব্দুর রহ্মান তাঁর প্রকাশিত ''ফকীর নায়ক মজনু শাহ'' গ্রন্থে খন্ডিত কবিতাটি পরিশিষ্টে ছেপেছেন এবং দাবী করেছেন যে এই কবিতাটি তিনি জমীরউদ্দীনের উত্তরাধিকারদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। চিরাচরিত মতামতের বিদ্ধে এই কবিতাটির বিষয়বস্তু ইতিহাস চিন্তার জগতকে পরিবর্তিত করেছে। যে নতুন তত্ত্ব বা মতবাদ এতকাল ধরে সুপ্ত অবস্থায় ছিল তাকে উত্তপ্ত করে তোলার পেছনে এই

কবিতার বিষয়বস্তু অনেকটাই কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। কবিতার বিষয়বস্তুকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে পীর মুরিদের সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে কী ভাবে মজনু শাহ পীর কতুব ও পীর বাহরামের অ াশীর্বাদ লাভের জন্য নানা জায়গা পরিভ্রমণ করে খানকার খাদিম বুড়া পীরের দোয়া লাভ করেন, কবির ভাষায়

"খানকার খাদিম ছিল এক বড়া পীর।
তেনারে সালাম দিল মজনু ফকীর।।
খাদিম মজনুর "দেহে" বুলাইল হাত।
"পুঁইছ করিলেন" কিছু "পুশিদাই" বাত"
কহিলেন, থাক বেটা খুশী যত দিন।
"ইনছানের" সেবা কর নিজে হইয়া হীন।।

গরীবের সেবা করলেই যে ফকিরী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যাবে এবং পীর বাহ্‌রাম যে পথের সন্ধানে রয়েছেন তা হাসিল করা সম্ভবপর হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দণ বাংলার যে আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল সেই ভেঙ্গে পড়া কাঠামোকেপুনদ্ধার করার কাজে ও কৃষক ও কারিগর যারা ক্ষুধার্ত তাদের স্বার্থ যাতে ক্ষুন্ন না হয় সে ব্যাপারে পীরের নির্দেশ কবির কণ্ঠে শোনা যায়। পুর - মুরিদ সম্পর্কের রূপরেখা যে গাঢ় ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত কৃষকদের অন্ন - বাসস্থান যোগাড়ের ব্যাপারে পীরের তৎপরতা থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে মনেও করা যায় না, পীরের। গ্রামে যাতায়াতকালে হয়ত তাদের ধর্মীয় ভাবধারা ও উপদেশ গ্রামীন মানুষের মনে াজগতে এক প্রভাব বিস্তার করেছিল কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এর সুযোগে ফকিরদের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বাংলার জমিদারদের বিদ্ধে যে বিক্ষোভ ছিল সেই বিক্ষোভের সঙ্গে কৃষকদের বিক্ষোভকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছিল। ফকিরদের কাছে গ্রামের অভ্যন্তরে যাওয়ার অর্থ দুটি, প্রথমতঃ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত দরগায় দরগায় উরস্‌ উপলক্ষে তারা যাতায়াত করত ও তাদের ধর্মীর আচার - অনুষ্ঠান পালন করত। গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধার দান হিসাবে অর্থ-বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করত ।সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ধর্মীয় আবরণ ও ধর্মীয় ত্রিয়াকলাপ সাধারণ মানুষদের মনে তাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করত তারই বাহ্যিক প্রকাশ অনুদান বা জমি জায়গা দান। কিন্তু এই অনুদান বন্ধ হয়ে যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায়। ১৭৬৯ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ)বাংলার কৃষক বা জমিদারদের আর্থিক অবস্থা এমন এক তলানিতে পৌঁছেছিল যা তাদের জীবনধারণেৰ পথে এক অন্তরায় হিসেবে দেখা দেওয়ায় তাদের পক্ষে সন্ন্যাসী ও ফকীরদের স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সন্ন্যাসী ও ফকিররা প্রাথমিকভাবে বারবার আবেদন-নিবেদন জানিয়েছে যে যাতে সাধারণ মানুষ তাদের স্বার্থরক্ষা করে। স্বার্থরক্ষা তো দূরের কথা কোম্পানী যখন সন্ন্যাসী ও ফকির দমনে ব্যস্ত তখন বাংলার জমিদাররা ও কৃষক সমাজ কোম্প ানী সরকারের তাদের ধরিয়ে দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কবির দৃষ্টিতে মজনু শাহ পীরের নির্দেশে বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করে যে অন্ন যোগাড় করেছিল তা দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিল।

"গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষা মেঙে ভূখারে খাওয়াও
কয় দিন থাকিয়া হেতা ঝোলা কাঁধে লাও।
বহু গাঁও হইয়াছে বেবাক "বিরান"
ঘর ফেলিয়া পলাতক মজুর কির্‌ষান
দেশে দেশে ফিরে মজনু ভিখ্‌ নাহি মিলে
ভুখাদের কান্না হেরি চোট লাগে "দীলে",
মজনু ফকির আইল, ঘুরি কত জেলা।।
সঙ্গেতে আসিল লইয়া বহুতর চেলা।।
বুড়ো পীরে কহিলেন সব "আতহাল"।
শুনিয়া কাঁদিল পীর হইয়া বেহাল।।।
কহিলেন "দল বাঁধো নাগাদের সাথে।
তলওয়ার লহ বেটা জনে জনে হাতে।।

হানা দাও গঞ্জে গঞ্জে আনো চাল ধান।
ভূখাদের খেদমতে সঁপে দাও প্রাণ।।
জুটিল মজনুর সাথে হাজার ফকির।
দেখিতে দেখিতে হইল ফকিরের ভীড়।।
সন্ন্যাসী ও নাগা সাথে গাঁও আদমীজন।
কাছারীতে হানা দেয় খাদ্যের কারণ।।
তেনাদের সাথী হইল খারিজী লস্কর।
লুটিতে তাহারা কত জমিদার ঘর।।
কোম্পানীর কত কুঠি লুট হইয়া গেল।
রাজার সিপাহি বহু ''গায়েব'' হইল।।
মজনুর হুংকারে কাঁপে ত্রিভূবন।।
''তরাসে'' ফেরঙ্গগণ চূন করে মুখ।
রাইয়ত হিম্মত পায়, ভাবে যাবে দুখ।।
ধ্যন ধ্যন করে সব মজনুর নামে।
জমিদার লোক সব প্রাণ ভয়ে ঘামে।।
দেশে দেশে রটে গেল মজনুর যশ।
যেই পথে যায় সব প্রজা হয় বশ।।
কামারের মূল হাসি পাইল সুদিন
তৈরী হয় কর্মশালে অস্ত্র রাতদিন।

এই বিপরীতধর্মী ব্যাখ্যা কতটা ঠিক তা বিশ্লেষণ করা দরকার। মজনু শাহ নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল। তার অভিযান কোম্পানীর কাছে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। যে কারণে সন্ন্যাসীও ফকিররা কোম্পানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল "desolating blast" । মজনু শাহ যেমন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তেমনি জমিদার ও কৃষকদের কাছে মারাত্মক প্রকৃতির। তার হাত থেকে রেহাই প াবার জন্য জমিদার ও কৃষকরা যে এক গ্রাম থেকে পালিয়ে অন্যত্র যেত তার ভুরিভুরি নিদর্শন সরকারী নথিপত্রে পাওয়া যায়। ১৭৬৩ - ১৮০০ সালের মধ্যে ফকীররা যে কটি আক্রমণ চালিয়েছিল তার দুই - তৃতীয়াংশ জমিদার ও কৃষকদের বিদ্ধে গিয়েছিল। জমিদার বা কোম্পানীর বহু কুঠি যে লুট হয়ে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই।

কিন্তু সেই লুণ্ঠিত দ্রব্য কোনোভাবেই কৃষক বিশেষ করে দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়নি, বরং এই কৃষকদের বাধ্য করা হয়েছিল তারা যেন সন্ন্যাসী ও ফকিরদের যে অনুদান দিয়ে আসছিল তা যে কোনোভাবেই বন্ধ না হয়। অনুদানের টাকা আদায়ের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে জোর জবরদস্তি প্রয়োগ করা হোত তার প্রমাণ সরকারী নথিপত্রে লক্ষ্য করা যায় এক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক। মজনু শাহের সঙ্গে যে বরকন্দাজরা যে াগদান করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই বরকন্দাজদের লুঠপাঠ করার কাজে নিযুক্ত করা হোত এবং তারা একাজে অভ্যস্ত ছিল। এই বরকন্দাজদের মধ্যে কতজন বাংলার জমিদারদের কর্মচ্যুত সৈনিক তা অজানা থাকলেও এটা সত্য যে এদের বেশীরভাগ ছিল উত্তর, মধ্যভারত ও নেপাল থেকে আসা বেকার ও কর্মচ্যুত বাহিনী। সন্ন্যাসী ও নাগারা ফকিরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোম্পানীর বিদ্ধে লড়াই করেছিল বলে যে বক্তব্য দাবীকরা হয় তা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নয়। মহাফেজখানার রক্ষিত নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে যেহেতু ফকিররা সন্ন্যাসীদের মত যুদ্ধবিদ্যায় অতটা পারদশী ছিলনা সে কারণে তারা সন্ন্যাসী যোদ্ধাদের সাহায্য নিয়েছিল এবং এই সাহায্যের বিনিময়ে তাদের মাইনে নেওয়া হোত এবং কাজের পর এই যোদ্ধা সন্ন্যাসীদের তাড়িয়ে দেওয়া হোত। এছাড়া সন্ন্যাসী ও ফকিররা যে মোঘল যুগ থেকে নিজেদেরমধ্যে লড়াই ও মারামারি করত তার কথাও আমরা জানতে পারি। গ্রামের মানুষজনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এরকম কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিক্ষোভের সঙ্গে গ্রামের ম ানুষের বিক্ষোভকে একত্রিত করাভুলহবে, কারণ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিদ্ধে সন্ন্যাসী ও ফকীরদের বিক্ষোভের মূল ক

ারণ হোল প্রাথমিক পর্যায়ের তাদের অবাধ যাতায়াত ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলাফেরা নিষিদ্ধ করা। এর সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সন্ন্যাসী ও ফকিরদের চাঁদা আদায়ের প্রবণতায় বাধা সৃষ্টি করা। অন্যদিকে কৃষকদের কোম্পানীর বিদ্ধে বিক্ষোভের মূল ক ারণ হোল কৃষকদের কাছ থেকে যথেচ্ছ পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা। এই রাজস্বের টাকা যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় তাদের পক্ষে প্রদান করা অসম্ভব ছিল সে সম্বন্ধে নতুন করে আলোচনার অবকাশ নেই। তাহলে কৃষকদের বিক্ষোভকে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিক্ষোভের সঙ্গে কীভাবে একত্রিত করা সম্ভব সে বিশ্লেষণে আজ পর্যন্ত কোন গবেষক পৌঁছবার চেষ্টা করেননি। ফকির মজনু শাহ যে দীর্ঘ সময় লড়াই করার পর মারা যায় এবং তার দেহ কানপুরের কাছাকা ছি মাক্ওয়ানপুর অঞ্চলে সমাধিস্থ করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই।

গ্রামীন কবিতায় সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ প্রসঙ্গে নানাধর্মী আলোচনা পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে কোন সুনির্দিষ্ট ম াপকাঠি নেই। সন্ন্যাসী ও ফকিররা প্রাক্-মুঘল যুগ থেকে বাংলা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করত ও ত াদের ধর্মীয় আচরণবিধি পালন করত। সন্ন্যাসীরা অবশ্য এর সাথে সাথে ব্যবসা - বাণিজ্য, মহাজনী কারবার ও ভাড়াটিয় া সৈনিক হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করত। মহাজনী, কারবার ও তারা জমিদার ও কৃষকদের সঙ্গেও চালাত। তাদের অস্ত্র সমেত চলাফেরা ও চাঁদার নাম করে সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে টাকা আদায় ও অনাদায়ে নিষ্ঠুর আচরন প্রদর্শন সাধারণ গ্রামবাসীর মনে ভীতির সঞ্চার করায় গ্রামবাসীর 'নিরাপত্তা রক্ষার' তাগিদে কোম্পানী সরকার সন্ন্যাসী বা ফকিরদের সুযোগ সুবিধা আদায়ের বিপরীতমুখী। যার ফলে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের কাছে প্রাক্-কোম্পানী যুগ শ্রেষ্ঠ ছিল যেখানে কোন বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি, যে রাজত্বে তারা তাদের নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা করত পারত বা ত াদের কার্যকলাপে কেউ কখনও কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোমাপানীর শাসনের প্রারম্ভে সন্ন্যাসী ওফকিরদের বিক্ষোভের মূল কারণ দেশের স্বাধীনতা অর্জন নয় নিজেদের স্বাধীন ভাবনাচিন্তা ও ক্রিয়াকলাপকে চালিয়ে য াওয়া।

তথ্যসূত্র ঃ-

১। Kabiradasa, kabira – bijaka (ed) llkudeva sinha, Aahabad, 1972p.103 cited in D. N. L Lorenzen, 'warrior Ascetics in Indian History', Journal of American Oriental Society, vol. 98.1(1978) । কবীরের নিজের বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভবপর নয় বলে অনুবাদ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

২। জয়নারায়ণ ঘোষাল, কাশী পরিক্রমা, কলকাতা, ১৩১৭ (বঙ্গাব্দ) পৃঃ ১৭২-১৭৫

৩। পদ্মাকর, হিম্মত বাহাদুর বিদাবলী, কাশী নগর প্রচারিনি সভা, ১৩১১ (বঙ্গাব্দ)

৪। William Pinch, "who was Himmat Bahadur" Indian Economic and Social History Review, 35 ও ১৯৯৮।

৫। পুরো ইংরাজী অনুবাদ William Pinch এর আলোচনা থেকে নেওয়া হয়েছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com